ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 175-181
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.021

কাকদ্বীপের ভাষা

রিক্তা সরদার, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 11.11.2024; Accepted: 27.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Language is the unit by which man express his thoughts through a series of meaningful sounds or combinations of sounds. There are many debates about when, where and how language was first created. However, it is estimated that language originated and started during the period of Pithecanthropus approximately 20 million to 2 million years ago. Language is a living process. Needless to say that the process of changes. There is a wide difference between the language of the beginning of creation and the language of today's modern age. And this difference is in the structure of the sound, form, pronunciation of language. My topic of discussion is the language of Kakdwip region. Kakdwip region is a dialectal region of Bengali language. Linguistic diversity in the region will be explored by analyzing the language of Kakdwip region from a sociolinguistic perspective.

Key Words: *A Sociolinguistic Review, Analysis of Dialects, Phonetics, and Morphology of the Kakdwip Region*

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে কাকদ্বীপ মহকুমা অঞ্চলে একাধিক অঞ্চল থেকে মানুষ এসে এখানে বসতি স্থাপন করেন। যেমন-পূর্ববঙ্গ (অধুনা বাংলাদেশ), হাওড়া, মেদিনীপুর। ফলে তাদের মধ্যেকার আঞ্চলিক উপভাষার পার্থক্য থেকেই গিয়েছিল এবং সময়ের সাথে সাথেই এই অঞ্চলের উপভাষায় একাধিক উপভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে। যেসমস্ত আঞ্চলিক ভাষাগোষ্ঠীর জনসংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম তারা অনেকেই তাদের চারপাশের জনগোষ্ঠীর ভাষা ক্রমশ শিখে নিয়েছে এবং বলতে শুরু করেছে। ফলে তাদের আঞ্চলিক ভাষার বেশ কিছু বদল ঘটেছে। আবার শিক্ষার কারণে, ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে এসে তারা তাদের আঞ্চলিক ভাষাকে সংকুচিত তথা অবহেলা করেছে এবং ক্রমশ নিজেদের আঞ্চলিক উপভাষাকে হারিয়ে ফেলছে। এবং নানা আঞ্চলিক উপভাষার সংমিশ্রণে একটি আঞ্চলিক উপভাষা গড়ে তুলছে।

কাকদ্বীপ হল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার একটি মহকুমা। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে কাকদ্বীপ নতুন মহকুমা হিসাবে ঘোষিত হয়। এই অঞ্চলটি মুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত এবং সমুদ্র সমতল থেকে চার মিটার উঁচুতে অবস্থান করছে। কাকদ্বীপ শহরটি একটি গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ। আমরা যদি কাকদ্বীপ অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমারেখার দিকে লক্ষ করি তাহলে আমরা দেখতে পাব এর পূর্বে রয়েছে সুন্দরবন ও ঠাকুরান নদী, পশ্চিমে রয়েছে মেদিনীপুর ও হুগলী নদী, উত্তরে ডায়মন্ড হারবার এবং দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। এই অঞ্চলে রয়েছে ৪টি নদী, ২৭টি দ্বীপ ও ১টি খাল(হাতানিয়া-দোয়ানিয়া)।

কাকদ্বীপ মহকুমা সুন্দরবনের জনবসতির একটি বিশেষ অঞ্চল। এই অঞ্চলকে অনেকেই সুন্দরবনের বিস্তৃত অঞ্চলে যাওয়ার প্রবেশদ্বার বলে মনে করেন। ঐতিহাসিকদের মতে, বঙ্গোপসাগরের বুকে অসংখ্য দ্বীপের মধ্যে এই কাকদ্বীপ অঞ্চলে কাকেদের অগাধ বিচরণ ছিল। কেননা এই অঞ্চলে শবদেহ ভাসানো হতো। প্রচুর কাকের উপস্থিতির কারণে এই দ্বীপের নামকরণ 'কাকদ্বীপ' করা হয়েছে বলে তাঁরা মনে করেন। মঙ্গলকাব্যের মধ্যেও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার একটি অঞ্চল হিসাবে কাকদ্বীপের নাম পাওয়া যায়। ১৬৭৬ সাল থেকে ১৮৮৬ সালের মধ্যবর্তী সময়ে লিখিত কৃষ্ণরামদাসের 'রায়মঙ্গল' ও 'কমলামঙ্গল' কাব্যে কাকদ্বীপ অঞ্চলের পরিচয় পাওয়া যায়।

বর্তমানে কাকদ্বীপ মহকুমা অঞ্চলের জনসংখ্যা প্রায় সাত লক্ষ অতিক্রান্ত করেছে। এই অঞ্চলের নারী-পুরুষ উভয়ই বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত। নদীকে কেন্দ্র করে মূলত এই অঞ্চলের জনজীবন গড়ে উঠেছে। এই অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ মৎস্যজীবী পেশার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। এছাড়া রয়েছে কৃষিজীবী, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, কর্মকার, কাঁসারী প্রভৃতি জীবিকার মানুষ। মজার বিষয় যে এখানকার বহু মানুষ একাধিক পেশার সঙ্গে যুক্ত। মহিলারাও কোনো অংশে পিছিয়ে নেই পুরুষদের থেকে। সংসারের যাবতীয় কাজ সামলে তারা পুরুষদের সাহায্য করে চলেছে। বলা ভালো সমান তালে তারা ঘর-বাহির সামলাতে সক্ষম। যে সমস্ত পরিবারের পুরুষেরা মৎস্যজীবিকার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন সেই সব পরিবারের মহিলারা হাটে মাছ কেনা-বেচা করে থাকেন। আবার অনেক পুরুষ ও মহিলা রয়েছেন যারা সরাসরি মাছ ধরার সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও মাছের আড়ত থেকে মাছ সংগ্রহ করে এনে হাটে হাটে বিক্রি করে থাকেন। আর এইভাবেই তারা জীবন-জীবিকা নির্বাহ করেন। একেবারে নদীর তীরবর্তী সংলগ্ন বসবাসকারী কিছু মানুষ চিংড়ি মাছের মীন ধরে সেগুলি শহর থেকে আসা ব্যাপারীর কাছে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে মীন ধরার জন্য তাদেরকে টাকা দিতে হয়।

এখানকার বেশিরভাগই মানুষ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। বছরের বিভিন্ন সময়ে তারা জমিতে নানান ফসল চাষ করেন। বর্ষায় অর্থাৎ আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ধান, মাঘ-ফাল্গুন মাসে সূর্যমূখী, কলাই চাষ করে থাকেন। এছাড়া সারা বছর অনেকে পানের চাষ করে বেশ লাভবান হন। যাদের নিজস্ব চাষের জমি নেই তারা ভাগ চাষি হিসাবে চাষ করেন। এই অঞ্চলের মানুষদেরকে প্রায়শই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। ফলে দারিদ্র্যতা তাদের সংসারের নিত্যসঙ্গী। তাদেরকে ঝড়-বন্যার সঙ্গে লড়াই করে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। বন্যার কারণে নদীর নোনা জল চাষের জমিতে একবার প্রবেশ করলে সেই জমিকে পুনরায় চাষের উপযোগী করে তুলতে তাদেরকে কায়িক পরিশ্রম করতে হয়। এছাড়া এই অঞ্চলে স্বর্ণ ব্যবসায়ী কিছু মানুষের দেখা মেলে। যারা বংশ পরম্পরায় স্বর্ণের ব্যবসা করে আসছেন। পাশাপাশি কুম্ভকার, কর্মকার, কাঁসারী সম্প্রদায়গত জীবিকার মানুষের বসবাস এখানে রয়েছে।

সমাজভাষাবিজ্ঞান বা Sociolinguistics শব্দটির মধ্য দিয়েই আমরা বুঝতে পারি সমাজ ও ভাষার পারস্পারিক সম্পর্ক আলোচনাই হল সমাজভাষাবিজ্ঞান। অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞান ও ভাষাবিজ্ঞান মিলিতভাবে তৈরি করছে সমাজভাষাবিজ্ঞান। আধুনিক সমাজভাষাবিজ্ঞানের প্রকৃত পথ চলা শুরু উনিশ শতকের ষাটের দশকে। ১৯৬৪ সালের কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজভাষাবিজ্ঞানের প্রথম সম্মেলনের হাত ধরে। সমাজভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে R. A. Hudson বলেছেন- 'the study of language in relation to society' আবার লেবোভ সমাজভাষাবিজ্ঞান বলতে বুঝিয়েছেন 'সমাজভাষাবিজ্ঞান পরিভাষাটি ভাষা ও সমাজের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করে। বাংলা ভাষায়ও সমাজভাষাবিজ্ঞান নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে। যেমন-নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'খুলনা জেলার মাঝির ভাষা'(১৯২৪), সুকুমার সেনের 'বাংলায় নারীর ভাষা'(১৯২৭) ও

'Women's Dialect in Bengali' (১৯২৯), ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের 'অপরাধ জগতের ভাষা' (১৯৭২), রাজীব হুমায়ুনের 'সমাজভাষাবিজ্ঞান' (১৯৮০), পবিত্র সরকারের 'ভাষা দেশ কাল' (১৯৮৪), মৃণাল নাথের 'ভাষা ও সমাজ' (১৯৯৯) ইত্যাদি। ফিশম্যান সমাজভাষাবিজ্ঞানকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন- বর্ণণামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান (descriptive sociology of language), সচল বা পরিবর্তমান সমাজভাষাবিজ্ঞান (dynamic), প্রয়োগমূলক ভাষাবিজ্ঞান(applied)। আমরা কাকদ্বীপ অঞ্চলের সমাজভাষার বৈচিত্র্য অনুসন্ধানে অগ্রসর হব বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের নিরিখে। এই বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের যে ফর্মুলায়তন করেছেন ফিশম্যান সেটি হল- 'Who speeks(or writes)what language(or what language variety) to whom and when and to what end.'। অর্থাৎ ভাষার বক্তা, ভাষার বিশেষ রূপ, শ্রোতা, ভাষা ব্যবহারের বিশেষ উদ্দেশ্য ও উপলক্ষ অনুয়ায়ী ভাষার পরিবর্তন হয়। আবার সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী অর্থাৎ বৃত্তি, বিত্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতা, লিঙ্গ, ধর্ম অনুযায়ী কীভাবে একটি সমাজের ভাষা পরিবর্তন হয়। একটি সমাজে বিভিন্ন পেশার মানুষের বসবাস থাকে। যেমন- কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, কর্মকার, কাঁসারী ইত্যাদি। এই বিভিন্ন পেশার মানুষের পেশা অনুযায়ী বিভিন্ন উপকরণের প্রয়োজনীয়তা থাকে। ফলে পেশার সঙ্গে ব্যবহৃত অসংখ্য শব্দের ভাষা বৈচিত্র্যতা দেখা যায়। নিম্নে পেশা অনুযায়ী কীভাবে ভাষার বৈচিত্র্য গড়ে উঠছে তা কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করব-

কৃষিজীবীর ভাষা: নেঙল (লাঙল) , জোল (জোয়াল), পাটা (মই), ধাবর (ধান ঝাড়ার জন্য ব্যবহৃত মূল উপাদান), কাঁকড়ি ধান (বৃষ্টি হওয়ার আগে জমি চাষ করে বীজ ধান ফেলাকে বলা হয় কাঁকড়ি ধান ফেলা), পেকে ধান (জমিতে কাদা করে চাষের উপযোগী করার পর অঙ্কুরিত ধান ফেলাকে বলা হয় পেকে ধান ফেলা), তোলা (ধান গাছ), জোলা-পাতলা (অসমান দুটি ধান গাছের লাইনের মধ্যবর্তী স্থান), পাই (ধান গাছের লাইন, এবং পাকা ধান কাটার লাইন), আঁখা (আঁটির অনুপযোগী), গাদা (খামারে ধান স্তূপাকারে সাজিয়ে রাখাকে বলা হয়), আগড়া (অপুষ্ট ধান) ইত্যাদি।

মৎস্যজীবীর ভাষা: বেন্তি (জাল), বাগদা (জাল), বেড় (জাল), ইলিশ (জাল), কমপ্লেড<পমফ্রেড (জাল), নাকুড়া< ভোলা (জাল), চাইনিস (জাল), চড় (জাল), টানাজাল, নেটজাল, ফাঁসজাল, ফুটজাল, গোঁজ মারা (নদীতে মাছ ধরার জন্য একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে বাঁশ পোঁতাকে গোঁজ মারা বলা হয়), বাম (১বাম=সাড়ে ৩হাত দূরত্ব। নদীতে ৩/৪ বাম নীচ পর্যন্ত বাঁশটি অর্থাৎ গোঁজ মারা হয়), সোলি (জালটিকে ভাসিয়ে রাখার জন্য একটি গোঁজ থেকে গোঁজের মধ্যবর্তী স্থানে বাঁশের যে অংশ থাকে তাকে সোলি বলে), পোঁটা (একটি জালের মধ্যবর্তী অংশ যে স্থানে মাছ আটকে থাকে), ফেতনা, ওয়ারলেস (এক নৌকা বা ট্রলার থেকে অন্য নৌকা বা ট্রলারে যোগাযোগ করার যন্ত্র), জাওড় (নদীর তীরবর্তী কোনো একটি স্থানে চৌকো করে মাটি কাটা থাকে, যেখানে অল্প জলে মীনগুলো বাছাই করা হয়), সাবাড় (একসঙ্গে অনেক মাছ শুকানোর স্থান বা পদ্ধতিকে সাবাড় বলে), টিপ<ট্রিপ(নদীতে মাছ ধরতে যাওয়াকে বলে), চড়া, জুয়ার<জোয়ার, গণ<পক্ষ, মুখ ভাটা<মুখ্য ভাটা, ক্ষার ভাটা (জোয়ারের এক থেকে দেড় ঘন্টা আগের সময়কে বলে ক্ষার ভাটা), কেঁকড়া< কাঁকড়া, বল, চাকা (জাল ডোবানোর কাজে ব্যবহৃত ভারী বস্তু) ইত্যাদি।

কর্মকারের ভাষা: দাবালি (দা), হেঁসো, বটি, উরঙ্গ, কোদাল, কাস্তে, নোঙর, কুড়ুল, টাঙি, শাবল, হাতুড়ি, অস্ত্র, ছেনি, হাম্বর, হাঁফর, বিশ্বকর্মার লাই, সাঁড়াশি, শান দেওয়া, চিমটে, চাপড়<চপার(মাংস কাটার ছুরি), ছুরি, ফার্সি, ইঁদুর কল ইত্যাদি।

কুম্ভকারের ভাষা: চাক<চাকা(যে উপাদানের উপর মাটি রেখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাটির জিনিস তৈরি করা), মাটি, চেড়ি, চাঁচা-চুঁচি, সুতো, ছুরি, ঢিকি<ঢোলক, তবলা, ফুলদানি, টব, ভাণ্ডার, ইলেকট্রিক হুইল।

কোনো একক ব্যক্তির মুখের ভাষা-ই হল নিভাষা বা Ideolect। একই ধরনের বা একই ধাঁচে কথা বলা বিভিন্ন ব্যক্তির বা একটি গোষ্ঠীর ভাষা হল বিভাষা। আর আঞ্চলিক উপভাষা হল কোনো একটি অঞ্চলের মানুষজন যে ধাঁচে কথা বলে সেই ধাঁচে হয়ত অন্য অঞ্চলের মানুষ কথা বলে না কিন্তু বুঝতে পারে। আবার একটি আঞ্চলিক উপভাষা থেকে যখন অন্য আঞ্চলিক ভাষার আমূল পরিবর্তন ঘটে, ভাষার বোধগম্যতা থাকে না তখন সেই অঞ্চলের ভাষাটি আলাদা ভাষা হিসাবে গণ্য হয়। আমার আলোচিত ভাষা অঞ্চল কাকদ্বীপ অঞ্চলটি রাঢ়ী উপভাষার অন্তর্গত একটি বিভাষিক অঞ্চল। এই অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ মান্য রাঢ়ী ভাষায় কথা বলেন না, তাদের কথা বলার ধাঁচে তাদের নিজস্ব একটি বৈচিত্র্য রয়েছে। তারা রাঢ়ী উপভাষার যে বিশেষ বিভাষায় কথা বলেন তা ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে তুলে ধরব।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য: কাকদ্বীপ অঞ্চলে যেহেতু একাধিক অঞ্চলের মানুষ এসে বসতি স্থাপন করেছেন সেহেতু এখানকার মানুষের মুখের ভাষায় তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষা অর্থাৎ যে অঞ্চল থেকে তারা এসেছে এবং যে অঞ্চলে বর্তমানে বাস করছেন উভয় উপভাষায় কথা বলতে শোনা যায়। ফলে এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন থেকে ব্যবহৃত একাধিক উপভাষার সংমিশ্রণে একটি নতুন উপভাষা তথা মিশ্র উপভাষার সৃষ্টি হয়েছে, যা এই অঞ্চলের উপভাষাতে আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছে। এই অঞ্চলের কিছু ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিম্নে দেওয়া হল-

- ‘ও’ কখনো কখনো ‘উ’-কার রূপে উচ্চারিত হয়।
  যেমন- তোমার > তুমার।[তুমার হইসে একশো পঁচিশ, আমি কম করে ধরসি।] জোয়ার > জুয়ার। [জুয়ারের সময় জাল পাততি হয়, বুঝছস্]
  বোন > বুন ইত্যাদি।
- ‘ন’ ধ্বনি ‘ল’ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে।
  যেমন- নিয়ে > লিয়া। [ওরা ভোলে বাবাকে লিয়া যাবে।]
  নড়বে > লড়বে। [আমি সুগার পেসেন্ট গরম জলে চান করি, ঠান্ডা জলে করলে দাঁতগুলো লড়বে এই আরকি।]
  নিতে > লিতে। [আমফানের সময় অনুদান লিতি হবে তাই সোবাই ন্যাংটা হয়ে টোলারে উঠে গেলি।]
  নিয়ে > লে। [ওসব কথা চিন্তা করিনে সাইকেল লে চলে যাব।]
- ‘অ’-কার ‘ও’-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন- খরচা > খোরচা, পঞ্চাশ > পোঞ্চাশ, সকাল > সোকাল, সপ্তাহ > সোপ্তা, ট্রলার > টোলার, সবাই > সোবাই , কলা > কোলা ইত্যাদি।
- ‘এ’-কার ‘ও’-কারে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন- দেওয়া > দোয়া, নেওয়া > নোয়া।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য: কাকদ্বীপ মহকুমা অঞ্চলের সমাজ-উপভাষাতে যেসমস্ত রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা পাই সেগুলি হল-

- পান দিয়াও শান্তি নেই, যতক্ষণ এই পান পাল্টানো হবে এরা নিজেদের পছন্দ না হলে এরা লিবে না। -এখানে আমরা ‘ন’ ধ্বনির allomorph বা সহরূপিম রূপ দেখা যাচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ‘ন’ স্থানে ‘ন’ বসছে আবার কোনো কোনো স্থানে ‘ন’> ‘ল’ এর রূপ নিচ্ছে।
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসমাপিকা ক্রিয়াকে সমাপিকা ক্রিয়াতে রূপান্তরিত হতে দেখা যায়। যেমন- দাঁড়িয়ে আছি > দাঁড়িছি। [পান পাল্টানোর ঘরের কাছে দাঁড়িছি।]

ভুলে গেছি > ভুলিছি। [জিনিসটা লিতি ভুলিছি।]
বাছাই করছিলাম > বাছাইছিলি। [কাল পান বাছাইছিলি]

- উত্তম পুরুষে ব্যবহৃত ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ার রূপকে মধ্যম পুরুষে ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা যায়। যেমন-

(i) তুমি কি আমার সাথে লাটে যেতে পারব? [তুমি পারবে > তুমি পারব]
(ii) শুক্রবার কিন্তু দুয়ারে সরকার মাথায় রাখব। [বক্তা- 'তুমি' উহ্য]

আন্বয়িক বৈশিষ্ট্য: একটি অঞ্চলের মানুষের ভাষায় বাক্য ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তার সামাজিক অবস্থান তথা সেই অঞ্চলের পরিচয় অনেকাংশে বোঝা যায়। কাকদ্বীপ যেহেতু রাঢ়ী উপভাষার একটি বিভাষিক অঞ্চল সেকারণে রাঢ়ী অপেক্ষা আমূল কোনো স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য আমরা পাব এমনটা আশা করা অমূলক। বাংলা বাক্যের কর্তা, কর্ম, ক্রিয়ার নিয়ম অনুসারে এই অঞ্চলের মানুষ বাক্য গঠন করলেও তারা স্বতন্ত্র একটি বিভাষিক অঞ্চল হিসাবে নিজেদেরকে আত্মপ্রকাশ করে অন্যান্য বিভাষিক অঞ্চল থেকে আলাদা হয়ে। এই অঞ্চলের মানুষের ভাষায় বাক্য গঠনের যে বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা দেখতে পাই তা হল-

- প্রতিনির্দেশকমূলক শব্দ ব্যবহার করে আশ্রয়ধর্মী বাক্য গঠনের প্রবণতা দেখা যায়। যেমন- যখন-তখন, যারা-তারা, যে-সে ইত্যাদি।

(i) কাল যখন পান বাছাইছিলি তখন ফোনের পর ফোন আসছিল।
(ii) আমানে ওখানটায় না, যারা নদীর ধারে বাড়ি আছে বা বড়ো বড়ো টোলার আছে জানবে তারা।

কাকদ্বীপ অঞ্চলের প্রায় সকল মানুষই বাংলা ভাষায় কথা বলেন। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি যে এখানকার সকল মানুষই বাঙালি। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের প্রায় সমস্ত লোকউৎসবই এই অঞ্চলে পালন করার পাশাপাশি আরোকিছু লোকউৎসব এই অঞ্চলে পালন করা হয়, যা এই অঞ্চলকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। এই অঞ্চলে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের বাস। যেমন- হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান। যেমন-হিন্দুদের ভেলাভাসানো, গঙ্গাপূজা, লক্ষ মেলা (মাঘচতুর্দশীতে কালীপূজা , এই পূজা শুরু হয় সরস্বতী পূজার ঠিক পাঁচদিন পরেই।), গাজন গান, পৌষমেলা ও গঙ্গাস্নান ইত্যাদি। মুসলিমদের মহরম, ঈদ।

ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে আমরা এই অঞ্চলে যে লোকসাহিত্যগুলি পাচ্ছি সেগুলি হল গাজন গান, বাউল গান, মন্ত্র (ঝাড়ফুঁক) ইত্যাদি। এই লোকসাহিত্যগুলির মধ্য দিয়ে আমরা তাঁদের জীবন-জীবিকা, সংস্কৃতির পরিচয় পাই। এই লোকসাহিত্যগুলিতে অধিকাংশ সময়ই তাঁরা নিজেদের আঞ্চলিক ভাষাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। লোকসাহিত্যগুলিতে তাঁরা সমাজের সমসাময়িক বর্তমান পরিস্থিতি ও ঘটমান ঘটনাগুলি তুলে ধরেন মজারছলে। পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতার শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এই অঞ্চলের প্রধান লোকসাহিত্য গাজন গান ও বাউল গানের কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করব। এক্ষেত্রে আমরা তাঁদের লিখিত বানান ব্যবহার করেছি।

বাউল গান- 'হেলমেট'

''গাড়ী চড়তে লাগে বেশ
মনের মানুষ সঙ্গে করে ঘোরো সারাদেশ।
গাড়ী চালাও হেলমেট পরে
(করো) নিজেকে সেপ্টি
নিয়ন্ত্রণে চালাও গাড়ী
(রাখো) দুদিকে দৃষ্টি

(আবার) এই কথা না মানিলে হতেও পারো শেষ।...''

-এই বাউল গানের মধ্য দিয়ে বাউল শিল্পী সমাজকে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। আমরা প্রায়শই কমবয়সী ছেলে-মেয়েকে দ্রুতগতিতে বাইক, স্কুটি চালাতে দেখি হেলমেট ছাড়াই। ফলে সমাজের কথা মাথায় রেখে বাউল শিল্পীরা তাঁদের নিজেদের গান রচনা করেন। এছাড়া বর্তমানে সরকারি প্রকল্প অনুযায়ী সরকার থেকে তাঁরা মাসিক কিছু টাকা ভাতা পেয়ে থাকেন। তাই সরকারী নির্দেশে তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান করতে যেতে হয়। এইকারণে তাদেরকে লক্ষীর ভাণ্ডার, পথশ্রী অভিযান, লোকপ্রসার, কন্যাশ্রী ইত্যাদি প্রকল্প বিষয়ক গান রচনা করতে দেখা যায়।

গাজন গান-

''চাকর- মন্দিরেতে চলছে এখন মাগের অভিজান
নিরব হয়ে দেখছি শালা গবেট ইনডিয়ান
এরা মায়ের দুধের মান বোঝেনা দেখয় যে স্ট্যাটাস
নিলাম করে দেহটাকে বাড়াছে মোশান (সুর- ফুল কেনো লাল হয়)
বৌ- ছোটো মুখে বড় কথা মারবো মুখে থাপ্পড়
চাকর- টাকা পেলে যেথয় সেথয় খুলবে এরা কাপড়
বাবু- পারসনাল আমার মেটার তাতে তোর কি
চাকর- বেশি খেলে বমি হবে বাসি তরকারি
মা- ভাগ্যে ছিলো দুরভোগ, ছেলে পুষে পেলাম শোক...''

এই গাজন গানের মধ্য দিয়ে শিল্পী বর্তমান সমাজের চিত্রটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে ছেলের বউ শাশুড়িকে ভাত দিচ্ছে না, নিজের মায়ের উপর অত্যাচার ও অযত্ন দেখার পরেও ছেলের সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। সেই ছেলে বৌকে নিয়ে দিব্যি খুশ মেজাজে দিন কাটাচ্ছে আর টাকার জোরে দুনিয়াকে কিনে নেওয়ার স্বপ্ন দেখে যাচ্ছে। এই গাজন গানের মধ্য দিয়ে সামাজিক অবক্ষয়ের দিকটি দর্শকের দৃষ্টিগোচর করতে চেয়েছেন গাজন শিল্পীরা।

মন্ত্র: মোচকা লাগা (তেল মালিশের মন্ত্র- সকালে মুখ ধোয়ার আগে বা সন্ধ্যাতে ফুঁক দিতে হয়।)
হাড় কোচা মাস কোচা দিন কোচা
সমূল্য মোচার দুটো থালি পেরাপিড়ি করে
কার আজ্ঞে দোহাই মা কালির আজ্ঞে
আমার এই ফুঁকে (ব্যক্তির নাম) অঙ্গে থেকে খোটকা ব্যথা
শিগ্‌গির সার, শিগ্‌গির সার, শিগ্‌গির সার।

-এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পূর্বের মানুষ এই সমস্ত লোক বিশ্বাসের উপর ভরসা করে ডাক্তার দেখাত না। আজও বেশকিছু মানুষ এই বিশ্বাসের উপর ভরসা করে। পাশাপাশি ডাক্তারও দেখান। চিকিৎসাবিজ্ঞান উন্নত হওয়ার সাথে সাথেই এই সমস্ত লোকসাহিত্যগুলি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

বাংলা সাহিত্যে কাকদ্বীপের ভাষা: বাংলা সাহিত্যে বেশকিছু গল্প, কবিতা, উপন্যাসের পটভূমিতে ও ভাষায় কাকদ্বীপ অঞ্চল উঠে এসেছে। যেমন- বিভু নাগেশ্বরের 'মায়া গোয়ালিনীর ঘাট', 'ভানু ভূঁইর হাট', ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'সমুদ্র দুয়ার', 'নোনা', 'জলের সীমানা', সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ধানের গন্ধ', শিশির দাশের 'শৃঙ্খলিত মৃত্তিকা' ইত্যাদিতে। এই অঞ্চলের জনজীবন, সামাজিক রীতিনীতি, বিশ্বাস, জীবন-জীবিকার পরিচয় পাই এই সাহিত্যগুলির মধ্যে। উল্লেখিত সাহিত্যিকদের মধ্যে বিভু নাগেশ্বরই একমাত্র এই

অঞ্চলের মানুষ, বাকিরা নন। অর্থাৎ কাকদ্বীপের ভাষা যে কেবলমাত্র কাকদ্বীপের সাহিত্যিকের লেখনীতে ধরা পড়েছে তা নয়। অন্যান্য অঞ্চলের সাহিত্যিকরা তাঁদের সৃষ্ট চরিত্রের মুখে এই অঞ্চলের মুখের ভাষাকে ব্যবহার করেছেন।যেমন- ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'সমুদ্র দুয়ারে' আমরা পাই-

> ''ওই ব্যাটারির কত চাহিদা জানু? কাকদ্বীপের বাজার থিকে বাক্স বাক্স ব্যাটারি লিযাচ্ছে হাটের দোকানিরা-''[১২]

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে আমরা দেখিয়েছিলাম 'ন'> 'ল'রূপে উচ্চারিত হয় এই অঞ্চলে। তার বাস্তব উদাহরণ আমরা পাচ্ছি সাহিত্যে- 'নিয়ে যাচ্ছে > লিযাচ্ছে'।

কাকদ্বীপের ভাষা আসলে অঞ্চল বৈচিত্র্যে রাঢ়ী উপভাষার একটি বিভাষা। এই অঞ্চলটি গড়ে ওঠার শুরু থেকে আজও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা মানুষের সমাবেশ ঘটেছে। আবার নাগরিক জীবনের সংস্পর্শে এসে নিজেদের আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে অন্য আঞ্চলিক ভাষার সংমিশ্রণে একটি স্বতন্ত্র বিভাষিক জনগোষ্ঠী হিসাবে তুলে ধরেছে এই অঞ্চলের মানুষ। আমরা এখানে ভাষার যে ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, বাক্যতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করেছি তা যে কেবলমাত্র এই অঞ্চলে দেখা যায় সে কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি না কারণ এই অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত মানুষের জনবসতি গড়ে উঠেছে। সুতরাং অন্যান্য অঞ্চলে এই বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা অস্বাভাবিক না।

তথ্যসূত্র:

১। চক্রবর্তী, ড. উদয়কুমার, চক্রবর্তী, নীলিমা, (২০১৯) ভাষাবিজ্ঞান, দে'জ পাবলিশিং, পৃ.১৯।

২। চৌধুরী, কমল, চব্বিশ পরগণা, উত্তর-দক্ষিণ-সুন্দরবন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ জুন ২০১৬, পৃ.৩৩৭।

৩।https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%AA accessed 9th January 2024।

৪। সরকার, পবিত্র, ভাষা দেশ কাল, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা- ৭০০০০৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ কার্তিক ১৪৩০, পৃ.১৫৪।

৫। Hudson, R.A., Sociolinguistics, (2nd edition), Cambridge University press, New York, 2nd edition 1996, p.4।

৬। দাশ, ড. নির্মল, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা- ৭০০০৫০, ১৪০৭ পৃ.৩৩৬-৩৩৭।

৭। সরকার, পবিত্র, ভাষা দেশ কাল, মিত্র ও ঘোঘ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা- ৭০০০০৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ কার্তিক ১৪৩০, পৃ.১৫৬।

৮। ঘোষ, তারাপদ (সম্পা.) পশ্চিমবঙ্গ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ, ৩রা চৈত্র ১৪০৬ পৃ.২৫২।

৯। ক্ষেত্রসমীক্ষা- গোপাল সামন্ত, ৪৫(বয়স), দক্ষিণ শিবপুর।

১০। ক্ষেত্রসমীক্ষা- প্রবীর মিস্ত্রি, ৫০(বয়স), পাঁচ নং বাজার।

১১। ক্ষেত্রসমীক্ষা- তারক হালদার, ৫৬(বয়স), রামনগর।

১২। চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর, সমুদ্র দুয়ার, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ১১৬